ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি

ডায়েরি

ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি
ডায়েরি ডায়েরি ডায়েরি

এই যে আমি

সেলিম আল দীন

ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে

স্বস্তিবচন

প্রতিদিনের আমার আমির বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ এই টুকরো লেখাগুলো। জমা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে ক্ষরণ পাত্রে। পৃথিবীর ভোর- অকস্মাৎ দ্বিপ্রহর, কখনো সাঁঝ কখনো বা রাতের সঞ্চরণশীল মেঘ ও তারার ঝাঁক সে পাত্রে ছায়া ফেলেছে কতোবার কতোভাবে।

এ নিতান্তরূপে দিনলিপি নয়। লেখাগুলোর শিরোভাগে যে দিন-তারিখ দেয়া হয়েছে তা সে মুহূর্তের স্মরণ চিহ্ন। ভেবেছি কখনো তা হঠাৎ উল্টেপাল্টে দেখে আনন্দিত হবো যে, ঐ সময়টাতে ঐ ভাবনাটা মাথায় এসেছিল।

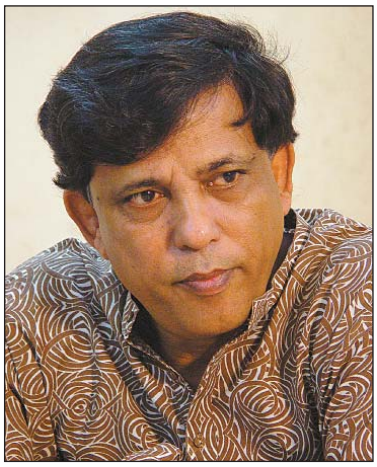

সেলিম আল দীন

এ দিনলিপি যে নয় তাও নয়। কারণ এর তারিখগুলো লেখবার দিন থেকে ক্রমেই সামনে এগিয়ে গেছে। ফলে সে অনুক্রমে এর লেখকের ভাবনার একটা পঞ্জিকার সন্ধান মেলে বটে। কিন্তু তা কোন পারম্পর্যে যুক্ত হবে তা আমার বোধগম্য নয়।

লেখাগুলো কাব্যবর্তী- কিন্তু কবিতা নয়- আর গদ্য যে নয়- সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আবার গদ্যের ঢঙটা যে লুপ্ত করতে চেয়েছি স্বেচ্ছায়- তাও নয়। যেভাবে ভাবনার স্বেদকম্পনে নেমেছে লেখা সেভাবেই রেখেছি। ভয় ছিল, লেখার শিল্পরীতি যদি দেখবার অনুভব করবার স্থানটা দখল করে- তবে সৌন্দর্যতত্ত্বের আড়ালে আমি'র অন্তরছাপে উপসন হবে কৃত্রিমতার।

বিশ্বজুড়ে গণশিকারীদের হত্যা নির্দেশের উচ্চকিত চিৎকার, সমগ্র ভূগোল জুড়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাভিশ্বাস এবং এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভেতর হত্যা ও মৃত্যুর মড়কপ্লাবন- তার মধ্যে দিনপঞ্জির ছদ্মাবরণে একান্তরূপে আপনার করে পৃথিবীকে দেখা- একেবারে বিপরীত স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় নাকি।

কিন্তু তবু জানি এ পলায়ন নয়- বরং লেখাগুলো হয়তো একদিন এই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা নির্জন স্থলে দাঁড়িয়ে মানুষের অপঘাতকে ঐশ্বরিক বিশ্বাসে অগ্রাহ্য করেছে। স্রষ্টার অমৃত প্রবাহ ঠিকঠাকমতোই চলেছে ভোর ও সাঁঝে- ঋতুর আবর্তনে।

বৃক্ষ তার স্বভাব পাল্টায়নি- কুঠার হাতে এগিয়ে গেলে সে এখনো শিকড় বাকড় তুলে হত্যার ভয়ে পালায় না। ক্ষুদ্রতম তৃণেও জাগে মঞ্জরীর গর্ভথোড়। মেঘের সার চলেছে ভাদ্র ফুরানো দিনে- ঋতুর পেটরা খুলে সাজবে হেমন্তিনী। সব ঠিকঠাক আছে- বদলেছে কিছু মানুষ। এতটা বদলেছে যে পুরান কথার পিশাচদের এখন আর পুরান কথার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে না। তারা নানা বেশে নানা নামে একেবারে জ্বলজ্যান্ত পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। হাতে শস্ত্র-হত্যাকে সঙ্গীতজ্ঞান করে তারা।

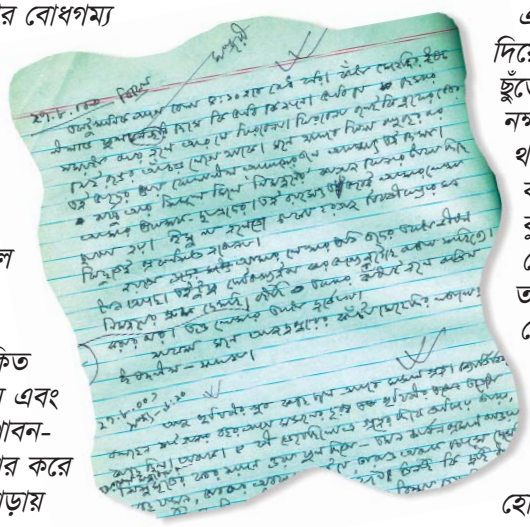

এ লেখাগুলোর ভেতর দিয়ে আমি নদী ও প্রভাত ছুঁতে চেয়েছি- মানুষ ও নক্ষত্র দেখে নিজের বেঁচে থাকার আনন্দ যাচনা করেছি। প্রতি মুহূর্তে বুকের ভেতর যে মৃত্যু ফেনাশ্বাস ঘনায়ে ওঠে- তাকে এড়ায়ে দেখতে চেয়েছি অদৃশ্যের অঙ্কিয়া।

অনন্তর- এ লেখার পাঠকারীগণের উপর নিরন্তর শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩.০৫.২০০১
রবিবার, রাত্রি

উন্নিদ্র রাত্রিগুলোতে গোলাপীবর্ণ লেক্সেটেনিল খেতে হচ্ছে। দূর শূন্য সৌরজগৎ থেকে সসার। সুঁই-এর সুতীক্ষ্ণ শীর্ষে ঝলসে উঠছে রাত। একটা শুভ্র প্রশান্তির কার্পাস সূতা এই অতলে নামিয়ে রাত্রির গভীরতা পরীক্ষা করছিলাম। সুতা নামাতে নামাতে অপরিমাপ্য। গুটাতে গুটাতে দেখি হাতে ধরা শুভ্র অংশটুকু ব্যতিরেকে বাকি সবটাতে আঠাল আলকাতরা। যাকে বলি রাত্রি।

ভেতরের টানটান সঙ্গীতমুখা স্নায়তন্ত্রীগুলো ছিঁড়ে যদি যায়। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ন্ত কার্পাস ফুটি জ্যোৎস্নায় যার গর্ভে বৃক্ষবীজ বিন্দু। ভোরে দেখব সুনিদ্রার বীজাঙ্কুরে ভরে গেছে বিছানা ও বিশ্বপ্রান্তর।

২৭ মে ২০০১
রাত্রি ২.৩০

তীক্ষ্ণচোখে দক্ষিণ পূর্বাকাশে তারা দেখে ঘুমাতে যাই মধ্যরাতেরও পরে। রোমান যুদ্ধদেবতা মার্স। বিছানায় শুয়ে দেখি ভ্রূ বিন্দুতে লেগে গেছে নক্ষত্রকণা। সে আর ঘুমাতে দিচ্ছে না কিছুতেই।

হঠাৎ নক্ষত্রের আয়ু ঢুকে যায় নিদ্রাকাতর শরীরে। আমি ভাসতে থাকি। মীথের ফেনার ভেতর গ্রহের আনন। তারপর আলোর গতিতে আয়ু ফুরাতেও আর দেরি লাগে না। আমি দেখতে পাই, কাত হয়ে থাকা কঙ্কাল আমার বিছানায় মাংসত্বক অবিভাজ্য। তবু ভেতরে একটা কঙ্কাল তাকে আমি অন্য কঙ্কালের অভিজ্ঞতায় জানি। নিজের ভেতরের কঙ্কালকে চিত্র জাগিয়ে জানি।

সে কথা বলে না নিরুত্তর। শতবর্ষের ক্ষয় আমাকে ধুইয়ে দিয়েছে। মধ্যরাতে আমার দৃষ্টির রৌদ্রে দেখছি তাকে। এইভাবে নক্ষত্র ও নিদ্রার মধ্যস্থালীতে রোপণ করেছি নিজেকে। একটা সাদা হাড়ের কাঠামো সে।

আমাকে সে দেখে নিচ্ছে, আমিও তাকে।

২৭-২৮ মার্চ ২০০২

যুগান্তরের আলিমুজ্জামানকে বলেছিলাম, আমার দেখা একশ' মানুষের কথা বলব, নিয়মিত একটা কলামে। কেন যেন মনে হয়েছিল যে, ঐ একশ' মানুষ নিয়ে বলবার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক বিস্তার থাকবে। জীবনে আর কখনো দেখা হবে না এমন জীবিত ও মৃত মানুষদের বিবরণ থাকবে তাতে।

মানুষের পরিচয়ের একটা বড় অংশ মানুষের মধ্যে থাকে। বৃক্ষ, প্রাণী, ফুলেও সে পরিচয় বাহিত হয়। যেমন ধরো, আমি একটা মেহগিনি গাছ বপন করলাম- একশ' বছর পরে এসে কেউ দেখল। কিংবা কীর্তি-শ্বেতপাথরে নাম খোদাই। একশ' মানুষের সংখ্যাটা নিয়ে নিজের মনেই একটা তর্ক আছে। হোয়াই হান্ড্রেড ওনলি। এর উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত এই একশ' মানুষের কারো কারো মধ্যে আমার লেখার ভেতরে থাকা মানুষদের সূত্র গাঁথার আভাস মিলবে। কিংবা এও একটা অতৃপ্তি থাকে যে, সেসব মানুষ আমার লেখাতে আসেনি বলে একটা অপূর্ণতার প্রচ্ছায়ার খপ্পরে পড়েছি। আজ গোধূলির অবকাশে তাদের কথা বলে নিজর অপূর্ণতার লাঘব চাইছি। হয়ত এই এতো কিছুর- সবটুকু মিলিয়েই একশ' মানুষের কথা বলতে চাওয়া। সেসব ভগ্নাংশ মানুষের মুখের ওপর স্মৃতি সূর্যচন্দ্রের যেটুকুন আলো, তাইত বলতে চাই। থাক না আর কারণ বর্ণনা, থাকুক না তা লেখকের শিল্পবুদ্ধি থেকে দূরে। একেবারে বিনা কারণে ভালো লাগা থেকে বলা। দেবদূতগণ, স্মৃতি জ্বলে উঠুক জোনাকীর জ্বলে উঠে নিভে যাওয়া- আলোর কণায় কণায়।

২৯ মার্চ ২০০২
দুপুর

আজ ইশরাত জাহান নিশাতের সঙ্গে আলাপ হল। সাবলাইম থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট আগে। কিছু গুরুতর বিষয় নিয়ে কথা বলেছি নিশাতের সঙ্গে। নিজের ব্যাপারেও। নিজের লেখা, বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এবং নাট্য বিষয়ে তো বটেই।

ও ঢাকা থিয়েটারের উৎসব, সেমিনার, সম্মাননা প্রদান বিষয়ে বিস্তর প্রশংসা করছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ নিশাতের- এবং অনেক সরলও বটে।

আমি বলেছিলাম যে, নাসির উদ্দীন ইউসুফ প্রায় একাই এ উৎসবের সকল কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। জাহাঙ্গীরনগরে থাকি বলে, সার্বক্ষণিকভাবে উৎসবের কাজ করতে পারিনি। ১৯৮৪/৮৫ সালের উৎসবে কীরকম গায়ে খাটুনি দিতে পেরিছলাম। তার তুলনায় এবার লেখা জোখার কাজ ছাড়া আর তেমন কিছুই আমাকে দিয়ে হয়নি। দলের আর যারা, পীযূষ ব্যতীত, আফজাল, আসাদ কাউকেই সরাসরি পাওয়া গেল না। পীযূষের কথা অবশ্য আলাদা, ও যেমন ও তেমনি, যেটুকু করেছে- অন্তত আমার চেয়ে বেশি। মাঝে-মধ্যে ভিডিও শ্যুটিং-এর জন্য অনুপস্থিত থেকেছে। শ্যুটিংটা আমারই নাটকের। কাজ করতে করতে বাচ্চু প্রায় নির্ঘুম, অবিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তা প্রায় সব দায়িত্ব শেষ অবধি দলের প্রধান হিসেবে ওর ওপর এসে পড়েছিল- এমন যে, দেখে মনে হলো, হাজার দেড় হাজার মোবাইল ফোন- একাই ও করেছে। শেষমেশ সব কিছুতেই ও ক্ষিপ্ত হতে থাকে। সেটি আবার বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। দু-একবার আমার উপর মাল্টিপল বম্ব হয়েছিল- তবে আমি তা থেকে কৌশল হিসেবে হাসি-গাম্ভীর্য পাল্টা ক্রোধের দ্বারা আত্মরক্ষা করেছি। নিশাতের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অন্য বিষয়ে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের সাংসারিক ও পার্থিব ব্যর্থতার জন্য দায়ী করি, লেখার জন্য মাত্রাতিরেক দুঃসাধ্য পরিশ্রমকে। একটা সময় ছিল, যখন দেখা গেছে, আমি উন্মত্তের মত লিখছি- শকুন্তলা থেকে এই পর্বপালা। ওই নাটকটি লিখেছি সতেরো-আঠারো বারের মতো। কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল নাটকে গ্রামের পর গ্রাম দেখে বেড়িয়েছি। নোট রাখছি। শিথানের কাছে শাদা কাগজ কলম রেখে ঘুমাতে গেছি। একটা চরিত্র, একটা ঘাটনা যেমনি মাথায় এলো, অন্ধকারে তা খস খস করে লিখে ফেলছি। এই করে কোনো কোনো রাত এমন হয়েছে যে, মধ্যরাত কেটে গেলেও ঘুম আর আসেনি। চাকাতে পাঁচদিন সময় লেগেছে এবং তার মধ্যে নাওয়া খাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। হয়তো গোসলটা করেছি রাতে। খাবার খাচ্ছি মনে পড়লে। এই করে শত ভোর এসে গেছে, লেখার শিউলি ফুটবে এই দুরাশায়।

স্নায়ুর উপর এই অত্যধিক চাপ, আমাকে সংসারের দায় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। মা গেছেন, বাবা, বড় দুলাভাই, পিটপুবান মেজবোন। নিজের অকাল প্রয়াত পুত্রের মুখ দেখেছি ভুল জন্মের রক্তলালা মাখানো নিথর শরীর। ভেবেছি খোদার অমৃতস্বাদ পাবো লেখার ভেতর দিয়ে আর তাই শোকজয়ী শক্তি দেবে আমাকে।

আমাকে নিয়ে কাছের জনদের ভুল বোঝাবুঝি আমি নিরসন করব কি করে।

এইসব কথা নিশাতকে বলতে বলতে আমার বুকের কোনা একটু একটু করে ভাঙছিল। চোখ প্রায় ভিজে উঠেছিল।

১৭ মে ২০০২

আজ জৈষ্ঠ্যের এক কি দুই।

ক্যাম্পাসে দুঃসহ গরম। প্রতি বছরই এরকম গরমে ভাবি যে, একটা এয়ারকুলার কিনব। কিন্তু কেনা হয় না। ভাবি যে, যাকনা এ বছরটা আর দশজনের মত ফ্যান ঘুরানোর ঘুর্ণিতালের নিচে। ঘামতে ঘামতে ভাবি যে কাটুক না এভাবেই। প্রকৃতির কঠোরতর রূপকে এতটা আড়াল করলে জীবনী শক্তিতে একটা ভাটা এসে যেতে পারে।

ভোরে রোদ এতোটা সোনা যে মনে হয় শরত বুঝি। নির্মেঘ উদয় দিগন্তে সুবর্ণপুর সূর্য জ্বলে উঠছে। আর এরই মধ্যে ক্যাম্পাসের জারুল রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া- মেহগনির পাতা কাঁঠাল গাছের পাতার ছাউনি ঘর ঝকোমকো।

জারুলের বেগুনি রঙটা যৌবনের শুরুতে আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। মনে হতো এই রঙ নিরন্তর পান করি। পৃথিবীর সব রঙকে এই ফিকে রঙের কাছে তুচ্ছ মনে হত। শকুন্তলা লেখার অনুপ্রেরণাটাও এই রঙ থেকে পেয়েছি। মনে করেছি কালিদাস যাই বলুন আর গ্যেটে যেভাবেই দেখুন-শকুন্তলা জারুল বর্ণা নারী। সেই আবেগে ওই রঙের শাড়ি পরা কাউকে দেখলেই বেশ ভালো লাগতো।